SUBARNA

প্যাগাসাস
আবদুন্ নূর

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৮৭, মাঘ ১৩৯৩

দ্বিতীয় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৫, মাঘ ১৪২১

প্রকাশক
আহমেদ মাহফুজুল হক
সুবর্ণ
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, রুম নং ২৩৫
৩৮/৩ বাংলা বাজার। ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১২২৪১৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
কাইয়ূম চৌধুরী

কম্পোজ ও মুদ্রণ
ভেকটোরাস
ফোন: ০১৫৫৩৫৪০৩৯৪

ISBN 978-984-91481-2-8

PEGUSUS by Abdun Noor. Published by Ahmed Mahfuzul Haque, SUBARNA, Books and Computer Complex, 38/3 Bangla Bazar. Dhaka-1100. Second Print February 2015. Compose and printed by VectoRas. Tel: 01553540394

মূল্য
**২০০ টাকা**
US $10

আম্মাকে, আব্বাকে

# পূর্বকথা

প্যাগাসাস এক বিশ্বাসের রূপক। একদা মুক্ত এক বর্ণ স্বেচ্ছায় শৃংখলিত হল সাত সাগর তের নদী পেরিয়ে এসে এক অজানা তেপান্তরে। প্যাগাসাসে আমি সেই শৃংখলিত ভারতীয় বর্ণের যাঞ্ছাকে প্রকাশ করতে চেয়েছি। প্যাগাসাস হল রূপকথার সেই উড়তে চাওয়া পঙ্খীরাজ। পাখা রেখেও যে ওড়ার ক্ষমতা আহরণ করতে পারেনি।

গায়ানার সাথে আমার পরিচিতি দীর্ঘ না হলেও নেহাত ক্ষণস্থায়ী নয়। বিশ্বব্যাংকে যোগদানের পরপরই আমার প্রথম মিশন পড়ে গায়ানায়। সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সালে। দীর্ঘ তের বছর পরে আবার ফিরে যাই সেই প্রকল্পের প্রগতি নির্ধারণে। মে, ১৯৮৩ সালে।

আট লক্ষ অধিবাসীর ছোট দেশ গায়ানা। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রের উপকূলে। গর্বিত গায়ানীজরা ছয় জাতির দেশ বলে। পাঁচ জাতি এসেছে বাইরে থেকে। ভারতীয়, নিগ্রো, পর্তুগীজ, চীনা, ব্রিটিশ। আদিবাসী হচ্ছে আমেরিন্দিয়ান।

দেশ ছোট। অথচ উত্তর পঞ্চাশ থেকে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববার্তায় প্রথম সারিতে গায়ানা স্থান পেয়েছে। ধর্মঘট, দাঙ্গা, অসহযোগ, স্বৈরাচার, নির্বাচনে প্রতারণা, দলীয় বিভেদ। কী নয়। বিরোধের পর বিরোধ চলেছে দেশে। দলে দলে, বর্ণে বর্ণে। অথচ বিরোধ করেছে ধর্ম নিয়ে নয়। দাঙ্গা হয়েছে রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে। কে কম্যুনিষ্ট, কে মার্ক্সসিষ্ট, কে ক্যাপিটালিষ্ট, কে সোস্যালিষ্ট। প্রশ্ন উঠেছে স্বাধীন গায়ানার ক্ষমতা কার হাতে যাচ্ছে। সে কি সন্দেহবাদী ভারতীয়, উগ্র ও রুক্ষ নিগ্রো, না সুযোগ সন্ধানী চীনা কিংবা লোভী পর্তুগীজ, অথবা শৃগালধূর্ত ব্রিটিশ? কিংবা অবিশ্বাসী আমেরিন্দিয়ান?

সন্দেহ চারদিকে। কিন্তু সেই সন্দেহের মূল খুঁজে পাওয়া যাবে গায়ানার ইতিহাসে। ইতিহাস বলেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্লেভারী বিলুপ্ত হয় ১৮০৭ সালে। সেই সাথে গায়ানাতেও। ফলে গায়ানায় ব্রিটিশ সুগার প্ল্যান্টেশনগুলোতে ঘাটতি পড়ে কুলি-মজুরের, খামার কর্মীর। সেই ঘাটতি মেটানোর জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় শুরু হয় আমদানী চুক্তিবদ্ধ মজুরের। আসে পর্তুগাল থেকে, ভারত থেকে, চীন থেকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী কর্মী আসে ভারত থেকে। সর্বমোট দু'লাখ আটত্রিশ হাজার ন'শো ষাটজন ভারতীয় কর্মী গায়ানায় পদার্পণ করে। কলকাতার কাছে খিদিরপুর বন্দর থেকে বেশীর ভাগ জাহাজে পা তোলে।

এটা হল ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস সব নয়। ইতিহাসের চেয়ে বড় হল

কাহিনী যা ঘরে ঘরে বেয়ে এসেছে কল্পনায়, চিন্তায়, বেদনায়। বংশে বংশে নেমে এসেছে বিশ্বাসে। যেখানে ঘৃণা, কলংক, যন্ত্রণা মুক করে রেখেছে অগণিত প্রাণকে।

প্যাগাসাসের আলেখ্য যদিও কাল্পনিক, ঘটনা ইতিহাস আশ্রিত। কিন্তু রঞ্জিত নয়। কাহিনীর রচনাকাল মে **১৯৮৩**, এবং মার্চ ও মে **১৯৮৬**। লেখা হয়েছে জর্জটাউনে, ওয়াশিংটনে, জেনেভায় ও আদিস আবাবায়। রচনায় সহায়তার জন্যে বন্ধু ফখরুজ্জামান চৌধুরী ও অনুজপ্রতীম আহমেদ রেজার কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বিশ্বব্যাংক। ওয়াশিংটন ডিসি।
**১৫**ই জানুয়ারী। **১৯৮৭**।

আবদুন্ নূর

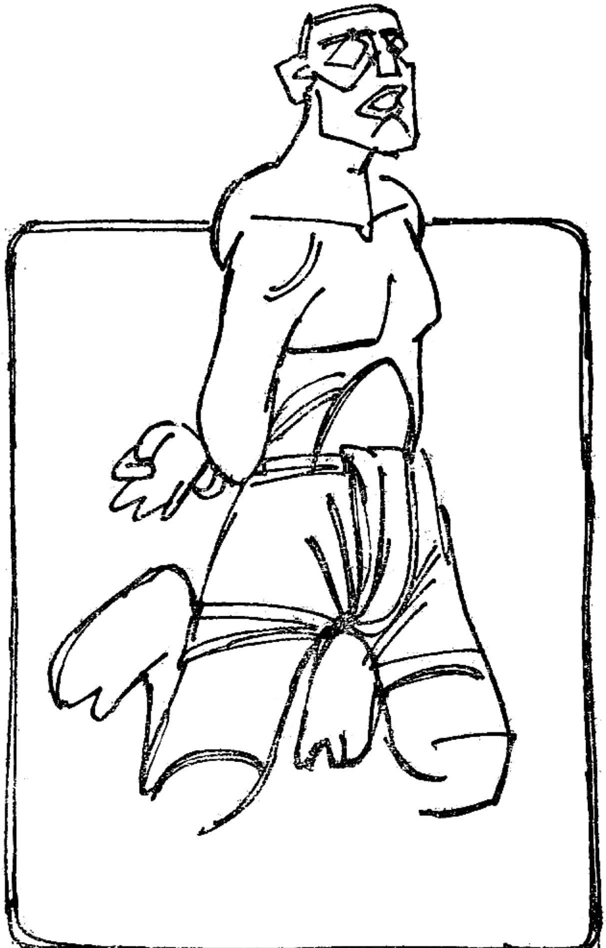

রীতা মজিদকে প্যাগাসাস হোটেলের হেয়ার ড্রেসার না হলেও চলতো। গায়ানার সম্ভ্রান্ত ভারতীয় সংসারে সুন্দরী ঘরণী হয়ে জীবন চলে যেতেও পারতো। পারতো পায়ের ওপর পা দিয়ে মেইড ও পার্টি নিয়ে দিন গুজরান করতে। পারলো না কেন রীতা মজিদ। সে ইতিহাস রীতা মজিদের এক অসফলতার ইতিহাস। রীতা মজিদের দুঃখের অবগাহন।

কবেকার কথা সেটা। ১৯৬৪ সাল। স্বামী হিসেবে মোহন শুধু আকাঙ্ক্ষিত নয়, জর্জটাউন সমাজে বলা যায়, বিশেষভাবে লোভনীয়। দেখতে সুন্দর, বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স কম, আটাশের কাছে। চাকরি ভালো, পাইলট। হোক না

সেটা ডিসি থ্রি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। নড়বড়ে জানালা, আর দরজা খোলা। হোক না সে জবেহ করা গোরু আর গায়ানীজ আমেরিন্দিয়ানদের বয়ে নিয়ে আসা পাইলট। মায়না তো ভালো, মর্যাদা আছে, কুলীনও কম নয়।

কথাটা মা পাড়তে সাহস পায়নি। বাবা রহমান মজিদকেই জিজ্ঞেস করতে হলো। কলেজে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলো রীতা। প্রথম বছর এবার কলেজে। হায়ার সেকেণ্ডারীতে ইংরেজীতে লেটার নিয়ে পাশ করেছে। ভর্তি হয়েছে জর্জটাউনের কুইনস্ কলেজে, বেশ প্রেসটিজিয়াস। বিশেষত ইংরেজীতে।

সবে কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে, বইগুলো বুকে নিয়ে, পরিহিত স্কার্ট সুন্দর করে ভাঁজ করে চটপট স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে বেরুচ্ছিলো রীতা। ক্লাসের মাত্র ঘন্টা দু'য়েক বাকি। প্রায় পাঁচ মিনিট হাঁটতে হবে। ইয়াং স্ট্রীট পর্যন্ত। সেখানে দাঁড়ালে দু'চার মিনিটের মধ্যেই পাওয়া যাবে স্ট্রীটকার। এক ডলারে নিয়ে যাবে স্কুলের সামনে। সব মিলে বাসা থেকে কলেজ খুব জোর কুড়ি পঁচিশ মিনিটের পথ।

তবে মুশকিল হলো ভোরের দিকে হ্যাকনী ক্যারিজগুলো ইটারিংবাং থেকে প্রায় ভর্তি হয়েই আসে। আসলে এরা হচ্ছে ট্যাক্সী। তবে বিশেষ বিশেষ রুটে চলে বাসের মতো। সে জন্যে ওর নাম হ্যাকনী ক্যারিজ। সে রুট রাস্তায় যেখানে খুশি নামা যায়, যেখানে খুশি ওঠা যায়। আর যতোদূর কম বা বেশি হোক না কেন, ভাড়া সেই একই। এক গায়ানীজ ডলার।

অসুবিধে হলো সকালের দিকেই। সারাটা দেশ যেন ভেঙে পড়ে জর্জটাউনে যাবার জন্যে। আনানদেল, নিউটাউন কিটি, বিঙ্গিল হ্যাম, আমস্টারডাম সবগুলো জায়গা থেকে হ্যাকনী ক্যারিজগুলো ভর্তি হয়ে আসে। সহজে কেউ নামতে চায় না ইয়াংটাউনের এই মোড়টাতে।

তবু রীতা মজিদের অসুবিধে হয় না। মাঝে মাঝে বন্ধু সিরাজ সিকদার তার ছোট ভেসপা নিয়ে চলে আসে বাস ষ্ট্যান্ডের কাছে। পাশে এসে দাঁড়ায় রীতা মজিদের। অল্প হেসে ভেসপার পেছনে উঠে পড়ে রীতা মজিদ। প্রায়দিনই ভোরবেলায় রীতা মজিদ আশা করে হয়তো সিরাজ সিকদারের ভেসপা ওর পাশে চুপটি করে দাঁড়াবে।

গুনগুন করে গান ভাঁজতে ভাঁজতে রীতা বেরুচ্ছিলো। রীতা শোন তো।

বাবার ডাকে চমকে ওঠে রীতা। বাবার এসময়ে এখানে থাকার কথা নয়। হোটেল প্যাগাসাসের এসময়ে ট্যাক্সির দরকার। ভাড়াও চড়া হয়ে উঠেছে। বিদেশী জর্জটাউনে যারা এসেছেন, সবার যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রহমান মজিদের ফ্লীটে রয়েছে সাতটি ট্যাক্সি। তাদের ম্যানেজ করতেই তার

এখন নাভিশ্বাস ওঠার কথা। খুব ভোরে বাবা রহমান মজিদ বেরিয়ে যান সে কারণেই। হঠাৎ এসময়ে তাকে দেখতে পেয়ে রীতা আশ্চর্য হলো।

চলো রীতা, তোমাকে পৌঁছে দিই কলেজে। বাবা ডাকছেন। অস্বস্তিবোধ করলো রীতা। এমনি বাবা ভারি ভারিক্কি মানুষ। তারপর সচরাচর কাছে ডাকেন না। রাইড দেয়ার কথা ওর এই সতেরো বছরের জীবনে কখনো দেখেনি।

মনে আছে একবার বাবা জু'তে নিয়ে গিয়েছিল। বছর চারেক আগে হবে। বয়স তখন সবে তেরো। মনে রঙ ধরেছে। আর সেই সময় জু'তে কৃষ্ণচূড়ার থকথকে লাল ফুলগুলো দেখে রীতার মনে হয়েছে রাশ রাশ যৌবন যেন আছড়ে পড়েছে জর্জটাউনের সী ওয়ালে। শাখারান্দার সবুজ পাতায় সবে মাত্র বেগুনী ফুলের উচ্ছ্বাস মেলেছে।

তোমার কাজ নেই ড্যাডি? বিজনেসে যাবে না?

জীবনটা শুধু কাজ করলে চলে না মা। সংসারও তো দেখতে হয়। রহমান মজিদ বলে।

একটু হাসে রীতা। সে তো তুমি মায়ের হাতেই ছেড়ে দিয়েছো। সংসারের কোন খবরটা তুমি রাখো শুনি।

সেটা সত্যি রীতা। বাবা বলে, তোমার মা না থাকলে আমার জীবনটা কি করে চলতো আমি জানি না।

রীতা বলে, সে খবরতো আমাদের সবার জানা। বাইশ বছর ধরে আমরা ঘর করছি এক মাকে নিয়ে, এক বাবাকে নিয়ে, কোনো তালাক নেই, কোনো বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই। গায়ানার সমাজে এ রকম ক'টি সংসার খুঁজে পাবে বলো? ক'টা গায়ানার মা এতো সময় ধরে এক সংসারের ঘানি টানেন?

তোমার মা, রীতা, সে তো গায়ানীজ ইণ্ডিয়ান নয়। সে ভারতের মেয়ে। আচরণে একটু তফাত তো হবেই। রহমান মজিদ গর্বের সঙ্গে বলে।

কথাটা তুমি বড় বাড়িয়ে বলো, বাবা। আমরা সবাই ভারতের ছেলে-মেয়ে, কুলির বংশধর–রীতা বলে।

সবাই, কিন্তু তোর মা নয়। আব্বা রিটোর্ট করে। জানিস, খুব সম্মানী ঘরের মেয়ে সে। তার নানী ছিলো গান্ধীর সহচরী। সে প্রায় সত্তর বছর আগের কথা।

রীতা সে গল্প এবং সে সংসারের ইতিহাস অসংখ্যবার শুনেছে। যতোবার শুনেছে, ততোবার মুগ্ধ হয়েছে। সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আসা দক্ষিণ ভারতের এক মেয়ের কাহিনী। গায়ানার জর্জটাউনে এলো রাজনীতিবিদের সাগরেদ হয়ে। প্রেমে পড়লো গায়ানীজ প্রেমিক পুরুষের। ছাড়লো রাজনীতি। ছাড়লো পিতার সংসার। অবগাহন করলো বিচিত্র এক কালচারে।

নানীর গল্প বাবার চেয়ে মায়ের মুখে মানায় ভালো। আবেগে আর মমতায় মার গলা কেঁপে-কেঁপে ওঠে। অনেক দিন রীতা শোনেনি সে গল্প। সিন্দ্রেলার কাহিনীর মতো বারবার ইচ্ছে করে শুনতে তার নানীর কাহিনী। সেই কবে ছোটবেলায় বিনুনি বাঁধতে-বাঁধতে মা বলতো, আর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হতো ওর।

আজ সন্ধ্যায় গিয়ে মাকে বলতেই হবে। শুনতে হবে সে গল্প আবার।

মায়ের গুণের কথা এখন থাক। ধমক দিয়ে ওঠে রীতা, তার পরেই চমকে ওঠে। বাপির জন্যে এখনো ঝংকার আসে রীতার গলায়। এখনো অভিমান আর আদর ভেসে উঠে ওর গলায়। হঠাৎ সাত সকালে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হলে কেন? রীতা জিজ্ঞেস করে।

বাবা রহমান মজিদ কোনো কথা বলে না। গাড়ীতে বসে গাড়ী ষ্টার্ট দেয়। পুরনো ভক্সহল, ১৯৪৫ সালে তৈরী। আজ থেকে উনিশ বছর আগের। বয়সী হলেও চলছে ভালো, আড়াই লাখ মাইল জুঝেছে। তিন লাখ মাইল যেতেও বেশি দেরি নেই। হাতের কাজ মেকানিক রমন সিং-এর। উনিশ বছরের এই পুরোনো ট্যাক্সিকে এখনো যেন নতুন মানুষের মতো ঝকমকে করে রেখেছে। অথচ যে দেশে ট্যাক্সিগুলো জন্ম নিয়েছে সেগুলো সেখানে এন্টিকের পর্যায়ে পৌঁছেছে, জাংক ইয়ার্ডে গিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

গরীব দেশের সেটাই সবচে’ বড় গুণ। মানুষ মরতে মরতে মরে না। জিনিশও পচতে পচতে পচে না। না খেয়ে থাকা প্রাণগুলো, হাঁটতে না পারা পাগুলো, পুরনো জংকার ধরা মেশিনারীগুলো মেকানিকের সোনালী স্পর্শ পেয়ে যেন তরতাজা হয়ে চলতে থাকে। অবিনশ্বর জীবন নিয়ে আসে।

যেমনি অবিনশ্বর জীবন নিয়ে এসেছিলো মোহন সিং-এর ডিসি থ্রি। প্রপেলার ঘুরতে না ঘুরতেই এক ঝকমকে হাসি দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠতো। টেক অফ করতে গিয়ে ডিসি থ্রি হঠাৎ একটা পিছুটান মেরে রুখে উঠতো। আর তারপরেই সটান এগারো হাজার ফিট ওপর দিয়ে উড়ে যেতো। দুটো পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে। পারতো মোহন সিং-এর জীবনকে এক সুন্দর অ্যাংগেলের মাঝে আকাশে তুলে দিতে।

যেমনি করে পেরেছে মোহন সিং একদিন রীতা মজিদের জীবন থেকে উড়ে যেতে। আর ফিরে এলো না। এলো না রীতা মজিদ চায়নি বলেই।

জীবনে কি করবি কিছু ভেবেছিস রীতা? বাবা জিজ্ঞেস করে।

ভাবার কি আছে বাবা, রীতা বললো, কলেজটা পাস করেনি, তারপরেই মেডিকেলে ভর্তি হবো।

কেন ডাক্তার হবি?

রীতা একটু রাগ হয়ে বলে, কেন, জানোনা বাবা? আমার নানীর শখ ছিলো ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু জীবনটাই কাটালেন শুধু নার্স হয়ে। সেই থেকে আমি ভেবেছি আমি ডাক্তার হবো।

রহমান মজিদ বলেন, ডাক্তার হওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়। পড়বি কোথায়? কলেজ কোথায়?

রীতা বলে, কেন, আর দুটো বছর মাত্র জর্জটাউনে পড়বো, তারপর না হয় কানাডায় চলে যেতে পারি।

খরচের কথা ভেবেছিস মা? দশ হাজার ডলার গুনতে হবে আমাকে প্রতি বছরে। চার বছর। কোথা থেকে পাবো?

রীতা বলে, খরচের কথা তুমি ভেবো না বাপী। আমি স্কলারশীপ পেয়ে যাবো, প্রথম বছর কোনো রকমে টেনে-টুনে চালিয়ে দিও। পরের বছরগুলো ঠিক আমি নিজের খরচ চালিয়ে নেব।

কি জানি মা, রহমান মজিদ বলে, পেলে ভালো। তবু আমি যা খবর পাই আমার কানাডিয়ান ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে সেখানে না কি ভীষণ কমপিটিশন। কানাডার সিটিজেনও ঢুকতে পারে না।

তুমি খামোখা চিন্তা করো না বেশী। কানাডায় না পেলে ডোমিনিকান রিপাবলিকে চলে যাবো। সেখানে খরচও অর্ধেক। সময়ও অর্ধেক। পাঁচ বছরের পড়া সাড়ে তিন বছরে শেষ করে চলে আসবো। ডাক্তার আমায় হতেই হবে।

সান্তা ডোমিনগোর এ দুটো মেডিকের কলেজের নাম শুনেছে রহমান মজিদ অনেকেরই কাছে। বিশেষত অন্য আমেরিকান ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে। অনেক দিন থেকেই খোঁজ-খবর নিচ্ছিলো। মেডিকেল কলেজগুলোর মাঝে কোথায় পড়াশোনা ভালো, কোথায় কম্পিটিশন কম। এবং কোথায় খরচ এমন কিছু বেশি নয়। তাকে খুঁজে বের করতে হবে এমন জায়গা যেখানে গায়ানার ভারতীয় কুলির বংশে ধারণ করা মেয়ে রীতা মজিদ ডাক্তার হয়ে ফিরে আসতে পারে।

সবার মুখে এক রা। না, রহমান মজিদ, কানাডায় নয়, আমেরিকায় নয়, বৃটেনে নয়, তাদের স্কুলগুলোতে নিজেরাই নিজেদের জায়গা করতে পারে না। শাদা চামড়ার ছেলেদের মাঝে ভীষণ কম্পিটিশন। ভারতীয় কুলির মেয়ে সেখানে আকর্ষণীয়া হবে না।

ক্যারিবিয়ান আইল্যাণ্ডে যদি পড়তে হয়, তাহলে সম্ভাব্য জায়গা শুধু দুটোই, ডোমিনিকান রিপাবলিক, আরেকটি কিউবা।

কিউবার কলেজগুলোর কথা শুনেছে। শুধু ভালোই নয়, ওখানে হাসপাতাল আছে, সেখানে কাজ করাও ভালো। তারচে' বড় কথা, ফিদেল ক্যাষ্ট্রো খুব খুশি মনে আহ্বান করেন থার্ড ওয়ার্ল্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের। উন্মুখ হয়ে নিতে তৈরি ক্যাষ্ট্রো গায়ানীজ ছাত্রীকে। সেজন্যেই রডরিওয়েজ ক্যাষ্ট্রোর পক্ষ থেকে স্কলারশীপ অফার করেছে রহমান মজিদকে। ওর মেয়ের জন্যে।

তবু মন সাড়া দেয়নি রহমান মজিদের।

গায়ানীজ সমাজে চেদী জাগানের সোস্যালিজমের ঘোষণা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি রহমান মজিদ। সে বিশ্বাস করে ফ্রি এন্টারপ্রাইজে, ক্যাপিটালিজমে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে জীবন শুরু করেছে। প্রান্তিক বয়সে এসে সাতটি ট্যাক্সি হয়েছে। খেয়েপরে বাঁচছে। ছেলে বড় হয়েছে। একটি মেয়ে কলেজে পড়ছে। পষ্টেল হাউসে চার লাখ ডলারের বাড়ি হয়েছে বাংলো প্যাটার্নের। কিউবার সমাজনীতিতে এটা কি সম্ভব হতো রহমান মজিদের? জেনেথ জাগানের ডাকে সাড়া দিলে পারবে কি রহমান মজিদ ওর জমানো ঐশ্বর্য্যকে ধরে রাখতে! লুকিয়ে রাখতে! তখন আসবে বখড়ার দাবী। ভাগাভাগির কলুষতা।

কিউবায় পড়তে যাওয়ার কথা নিজের কানে শুনেও উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারেনি রহমান মজিদ। সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা সে রীতার থেকে লুকিয়ে রেখেছে। শুধু রীতা নয়, তার মায়ের কাছ থেকেও।

রডরিওয়েজ জর্জটাউনে আসে প্রায়ই। কখনো পাঁচ সপ্তাহের জন্যে, কখনো তিন মাসের জন্যে। আর কখনো বা দু'দিনের জন্যে। কখনো একটানা ছ'মাস থেকে গেছে। আর কখনো এক রাত থেকে চলে গেছে। কিন্তু যখনই আসুক না কেন, এলেই রহমান মজিদের নিঃশ্বাস নেয়ার অবসর থাকে না।

আশ্চর্য মানুষ রডরিওয়েজ। এলেই তাকে ট্যাক্সি নিতে হবে। সারাক্ষণ সেটা বুক্‌ড্ থাকবে। দিন আর রাত। শুধু তাই নয়, রহমান মজিদকেই সেটা ড্রাইভ করতে হবে। দশ বছর ধরে চলে আসছে এই নিয়ম, এর কোনো হেরফের নেই। এর মধ্যে রহমান মজিদ সামান্য ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে ট্যাক্সি ওনারে পরিণত হয়েছে। কিছু নাই নাই করেও লাখপতি হয়েছে। তবু, আশ্চর্য মানুষ রডরিওয়েজ। রহমান মজিদকেই তাঁর চাই।

কতো জায়গায় যে গিয়েছে রডরিওয়েজ মজিদের সঙ্গে। কখনো চেদী জাগানের ঘরে, মধ্যরাতে। কখনো বার্নহ্যামের সঙ্গে দেখা করতে এক অচেনা পার্টিতে। আর কখনো বা সাধারণ ভারতীয়ের সঙ্গে। আবার কখনো মুর্খ চাষীর হাতে হাজারো রুবল গুঁজে দিয়েছে। রহমান মজিদ শুধু নিঃশব্দে দেখেছে।

চুপ করে থেকেছে। কিছুই বলেনি। শুধু এই দশ বছরের টানাপোড়েনে না পেরেছে রডরিওয়েজকে ভালোবাসতে, না পেরেছে তাকে ছুঁড়ে দিতে তার জীবন থেকে।

পড়াশোনাই কি সব কিছু মা, সংসার করার কথা ভাবতে হবে না? চমকে ওঠে রীতা। বাবার মুখে এ কথা তো আগে শোনেনি।

এতো সাত সকালে আমাকে সংসারী করতে উঠে-পড়ে লেগেছো কেন, বাবা? আমি তোমাদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি।

রহমান মজিদ চুপ করে শোনে, তারপর বলে, তা নয় মা তবে ভালো ছেলে চোখে পড়লে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় রীতা, সংসারটাই বোধহয় ভালো, পড়াশোনা করার চেয়ে।

রীতার চোখ কপালে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, কোনো ছেলে ভালো পেলে বাবা যে তুমি মেয়ের পড়াশোনা পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে সংসার তৈরি করতে বসছো?

কথাটার মধ্যে যেন কিছুটা কটাক্ষ রয়েছে মনে হলো রহমান মজিদের। চট করে মেজাজ চড়ে গেলো। কুলির মেয়ে হয়ে অনেক-অনেক পড়েছিস রীতা, এখন কি ডাক্তার হয়ে বুক্রার বিবি বনবি? তার চেয়ে কুলির মেয়ে কুলিই থেকে যা।

রীতা শুনে কিছুটা চঞ্চল হয়। কথার ধরনটা ঠিক বাবার মতো নয়। রহমান মজিদের নয়। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বাবাকে এই ভোর বেলায়।

তবু রীতা নরম গলায় বলে, আহা, নামটা বলো না, তোমার সেই মনের মতন ছেলেটি কে?

বাবা বলে মোহন সিং, পাইলট। রোজ ভোরে ডিসি থ্রী নিয়ে কুরুন্সীকু পাহাড়ে উড়ে যাওয়া পাইলট।

ইস্। সেই ছেলেটা। আমার সাথে ছেলেবেলায় খেলতো। গায়ের রং কি কুচকুচে কালো। ঠোঁট উল্টোয় রীতা মজিদ। ঠিক যেন ব্ল্যাকম্যান। ইণ্ডিয়ান ওকে মনে হয় না। রীতার কথা ঠিক। সে ফর্সা মেয়ে। মোহনের পাশে মোটেই মানাবে না।

বুঝে উঠতে পারেনি রহমান মজিদ। মোহন সিং-কে কেন তার পছন্দ হলো। কেমন করেই বা পছন্দ হলো। আর কেনই বা মেয়ের কাছে সেই পছন্দের খবর নিজে পাড়লো। আর কেমন করেই বা সেই বিয়েটা হয়ে গেলো। মনে হয় যেন পাতালপুরীর একটি নরোম থাম ধরে সামান্য নাড়া দিয়েছে রহমান মজিদ। আর তরতর করে হাজারো সিঁড়ির পিছল পথে রহমান মজিদের সব জীবন, সব বিশ্বাস, সব প্রবৃত্তি বিলীন হয়ে গেছে।

রীতার কথা শুনে তবু আক্রোশে কাঁপতে থাকে রহমান মজিদ। বড় হবার শখ হয়েছে। জাতে ওঠার শখ হয়েছে। কুলি কখনো জাতে উঠতে পারে। নিগার কখনো সমাজে বড় হতে পারে। যারা বড় হবার তাদের গায়ের রঙ আল্লাহ জন্মের আগেই ঠিক করে দিয়েছেন। শাদা হতে হবে। শ্বেত চর্ম। শাদা ঘোড়া। নিজের মনেই গজরাতে থাকে রহমান মজিদ। জেনেথ জাগানের মতো সারা দেশটা যেন ওরা কিনে নিয়েছে। গায়ানাকে লুটে পুটে শেষ করে দিলো।

এই গোঁ গোঁ করাটা বড় বদ অভ্যাস। রাগ উঠলেই অনবরত সে বকবক করতে থাকে। আর আপন মনে অনর্গল বলে যায় ওদের পুরনো ইতিহাস। আর সে সময়টায় স্ত্রী পারমিতা মজিদ পাশে না থাকলে ভয়ানক রাগ ওঠে ওর। রহমান মজিদের রাগ পড়ে পুরো সংসারের দিকে। যতো কাজ থাকুক না কেন পারমিতা মজিদকে সেসময় পাশে এসে দাঁড়াতেই হবে।

রীতা সেজন্যে সন্ত্রাস বোধ করে। একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে আমার বড়দাদা লুতফুল মজিদকে বৃটিশ যখন নিয়ে এসেছিলো তখন কে দেখেছিলো তিনি সৈয়দ বংশের ছেলে না নিকৃষ্ট কামীন জাতের। কুলির ছেলে না মেথরের ছেলে। দেখেছিলো বয়স। দেখেছিলো চেহারা। দেখেছিলো কাজ করার ক্ষমতা। খোঁজেনি চামড়ার রং। আর তারপরই জাল ফেলে, টেনে এনেছিলো সবাইকে খিদিরপুরের ডকে, জাহাজে।

সেটা বড় অন্ধকার কথা। সেটা বড় কলংকের কথা। কিন্তু সে কলংকের কথা মুখে মুখে নেমে এসেছে রহমান মজিদের ঘরে। নেমে এসেছে কোনেয়াল সিংহের সংসারে। নেমে এসেছে ক্লান্তিতে ভেঙেপড়া ইন্দোগায়ানীজ সংসারের প্রতিটি ঘরে। তাদের প্রতিটি কল্পনায়। আর সবই আপন কল্পনায় সে কাহিনীকে ফুলিয়ে রেখেছে, সাজিয়ে রেখেছে। সেদিনতো বংশের, জাতের আর রঙের, কোনো পার্থক্য ছিলো না।

বড়দাদা লুতফুল মজিদের স্মৃতি মনে পড়ে।

১৮৪৪ সালে। বাপ সৈয়দ বংশের। হলে কি হবে, টাকা পয়সায় ছিলেন নিতান্ত গরীব। এফ, এ. তে পড়াশোনার টাকা সংকুলান করাই কষ্টকর ছিলো। হঠাৎ দেখতে পেল বৃটিশ সাহেব জনসন তাদের বাড়ির চারধারে। বাবা ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, দু'দিন পরেই সাহেব আসবেন আবার একটি কাজে। তোমাকে সংগে নিয়ে যাবেন। মনে করে যাস কিন্তু।

কি কাজ? লুতফুল মজিদ জিজ্ঞেস করে।

গেলেই বুঝতে পারবি, বাবা বলে। আর শোন, যাবার সময় আমার তলোয়ারটা নিয়ে যাস।

কি করবো বাবা ওটা দিয়ে? ওটা তোমার মায়ের বিয়ের দেয়া চিহ্ন। লুতফুল মজিদ বলে।

নিয়ে যাস, সাহেবকে দেখাস, কাজে লাগবে। তবে কখনো কাউকে দিসনে। নিজের কাছে সবসময় রাখিস। বলে বাবা লুতফুল মজিদকে ছেড়ে মাগরিবের নামাজ পড়তে চলে গেলেন। আর সেই হলো বাবার সঙ্গে শেষ দেখা।

জনসন সাহেব এলো দু'দিন পরে। দিলো তুলে লুতফুল মজিদকে কোচোয়ান টানা ফিটনে। টগবগিয়ে ঘোড়া দু'টো এগিয়ে চললো। ভেতরে সাহেব বসে। পাশে বসে ভয়কাতর যুবক লুতফুল মজিদ। পরনে পাজামা আচকান। আর হাতে কাপড়ে মোড়া বাবার বিয়ের দেয়া তলোয়ার।

ওটা নিয়ে যাবে? সাহেব হেসে জিজ্ঞেস করে লুতফুল মজিদকে। মজিদ বললো ধীর গলায় ঃ বাবা বলেছিলো সঙ্গে রাখতে।

খুবই ভালো, আরো হাসলো জনসন সাহেব, মনে রাখার মতো কিছু চিহ্ন থাকা চাই।

কথাটার মানে তখনো পুরো বুঝতে পারেনি লুতফুল মজিদ। যখন বুঝলো তখন অনেক দেরি হয়েছে। খিদিরপুরের ডকে জাহাজ ডেভেনপোর্টের নোঙ্গর তোলা শেষ হয়েছে।

সারারাত পথে কাটালো ওরা দু'জন। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটলো আর সারারাত জেগে রইলো জনসন সাহেব, লুতফুল মজিদ, সহিস আর ঘোড়া দুটো। খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগে ওরা এসে নামলো খিদিরপুরে।

লুতফুল মজিদ অবাক হলো। দেখে বাজার যেন বসেছে চারপাশে। শ'চারেক ছেলে। আর গুটিকতক মেয়ে। খুব জোর বিশ কি পঁচিশ। কারো পরনে ধূতি, কারো পরনে পাঞ্জাবী, কারো পরনে প্যান্ট আর কারো বা নেংটি। মেয়েরা সবাই শাড়ী পড়ে। কারো চেহারা বুদ্ধিদীপ্ত, কারো চেহারা মনে হয় যেন নগণ্য। কারো মুখে ক্লিষ্ট সংসারের ছাপ। আর কারো মুখে রিক্ততার উজ্জ্বলতা। এতো ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে খুব কমই দেখেছে মজিদ।

সারি বেঁধে জাহাজে ওঠো তোমরা। ছেলেরা আগে। সারি বেঁধে। মেয়েরা পরে। হুল্লোড় করো না। কিন্তু হুকুম মানলো কি কেউ। কেউ আগে উঠলো, কেউ পরে উঠলো। কেউ টেনে-হিঁচড়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সব জাহাজে উঠলো। অবোধ্য চোখ তুলে।

জনসন সাহেব উঠলেন জাহাজে সবার শেষে। উঠেই হেসে বিলিয়ে দিলেন চৌকো শাদা কাগজের টুকরো। জাহাজের ডকে তখন হাঁটু গেড়ে ছেলেমেয়েরা। গোল করে বসে ছেলেরা। মাঝখানে গলার হারের লকেটের

মতো জড়ো হয়ে মেয়েরা বসে।

পড়ো এবং সই করো। যারা পড়তে জানো না তারা টিপসই দাও। বেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠেই ঘোষণা করলেন জনসন সাহেব।

এপাশে-ওপাশে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো ছেলেরা, মেয়েরা।

কি লেখা আছে কাগজে? কি সই করার কথা বলছে? কি লেখা আছে। অজানা চিন্তায় বুক চিরচির করে উঠলো লুতফুল মজিদের। অথচ জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না কারোর। সবাই একে অন্যের মুখের দিকে চাইতে থাকলো। চোখে, মুখে প্রশ্নের রেখাগুলো বড়সড়ো হয়ে উঠলো।

জনসন সাহেব বললেন, বুঝতে পেরেছি, জানতে চাও কি লেখা আছে? এ কাগজে লেখা রয়েছে বৃটিশ রাজের চাকরিতে যাওয়ার জন্য তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বৃটিশ রাজ মাত্র পাঁচ বছরের জন্যে তোমাদের চাকরিতে নিচ্ছে। সে চাকরির মেয়াদ শেষ হলে তোমরা আরো পাঁচ বছরের চাকরির চুক্তি করতে পারো। দশ বছরের চাকরির শেষে তোমরা বৃটিশ রাজের খরচে দেশে ফিরে আসতে পারবে। এ যাত্রায় তোমাদের সবার পূর্ণ সম্মতি আছে। কেননা তোমাদের সবার বয়স আঠারোর ওপরে। সুতরাং পূর্ণ সম্মতি দিয়ে তোমরা এ জাহাজে উঠেছো। এবং পুরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আকাশে যেন বাজ পড়লো। চোখ কান ঝালাপালা হয়ে উঠলো। কখনো শোনেনি, জানেনি, একি আজব চাকরির বন্ধন। একি অজানা চাকরির আহ্বান। সাহেব আবার বললেন, তোমাদের পিতামাতার সম্পূর্ণ সম্মতি নিয়ে আমরা এ চাকরির ব্যবস্থা করেছি। আমি কথা দিচ্ছি, তোমরা চাকরি শেষে এখানেই ফিরে আসবে। এবং আমরা তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের সংসারে ফিরিয়ে দেবো।

এবার আরো আশ্চর্য হলো লুতফুল মজিদ। অস্বস্তিও হলো, রাগও হলো। বাবা জানতেন্ বাবা নিজে সম্মতি দিয়েছেন। অথচ আমাকে বলেননি।

সাহেবের কথা যেন শেষ হতে চায় না। আরো বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমরা পাঁচশ' টাকা আগাম দিয়েছি, তোমাদের অভিভাবকদের কাছে। সে টাকা দিয়ে কেউ জমি কিনবে, কেউ ব্যবসা করবেন। তাদের জীবনের সুখের জন্য তোমরা বৃটিশ রাজের চাকরিতে এসেছ। প্রথম দু'বছরের জন্যে তোমাদের মায়না আগাম হয়ে গেলো। পরে তিন বছরের মায়না তোমরা পাবে।

আরো প্রশ্ন যেন মুখর হলো। কোথায় যাবো? কিসে যাবো? কেন যাবো? কি চাকরি? অসংখ্য প্রশ্ন জড়ো হয়ে এলো লুতফুল মজিদের কণ্ঠে। কিন্তু চেয়ে

দেখলো সবাই নিঃশব্দ, সবাই বোবা। অন্ধ, দুর্বল মুখগুলো। শুধু চোখগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কিন্তু মুখে কোন কথা নেই।

লুতফুল মজিদ নিঃশব্দে তার হাত বাড়িয়ে ছিলো। শাদা কাগজে আরবী হরফে ধীরে ধীরে সই করলো নিজের নাম, সৈয়দ লুতফুল্লাহ মজিদ।

যাত্রা শুরু হলো ডেভেনপোর্টে। মার্চ। ১৮৪৪ সাল।

কিন্তু মোহন সিংয়ের নানীর নানী প্রতিমার স্মৃতি অন্য। তেমনি অন্য এক এক করে সেই একশ' চৌচল্লিশ জন বাঙালীর স্মৃতি। যারা ১৮৪৪ সালের এক মূর্খ ভোরে সারি বেঁধে জাহাজে উঠেছে। ডেভেনপোর্টে এসেছে। যাত্রা শুরু করেছে নতুন দেশের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেকের কাহিনী ভিন্ন। প্রত্যেকের স্মৃতি ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন নয় সে স্মৃতির মধ্যে একটি সূত্র। সেই সূত্র হচ্ছে বঞ্চনার। সেই সূত্র হচ্ছে মিথ্যার। সেই সূত্র হচ্ছে অবরুদ্ধ অভিমানের।

বৃটিশরা বঞ্চনা করেনি আমাদের, বুক্‌রা সাহেব মিথ্যে কথা বলেনি? রহমান মজিদ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছেন। বঞ্চনা করেছে কুলির জাত, বঞ্চনা করেছেন আমাদের বাবা, মা, ঠাকুরমা। আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা। চতুর আমরা, চাতুরী আমাদের প্রবঞ্চনা।

অতীতের সে কাহিনী অনেকেরই মুখে মুখে, তার রং বদলায়, কথা বদলায় কিন্তু সুর বদলায় না।

প্রতিমার স্মৃতি অন্য থাকে। অন্য হলে সুর এক। পূজো দিতে গিয়েছিলো ঠাকুরমার সংগে। বিধবার পূজো। ছেলেবেলায় বিয়ে কখন যে হয়েছে, কখন যে মালা বদল হয়েছে, আর কখন যে পুতুল খেলতে-খেলতে তার জীবনটা শেষ হয়ে এসেছে খেয়াল নেই। তেমনি স্মৃতিতে হারিয়ে গেছে স্বামীর মৃত্যুর দিনটি। অথচ, আশ্চর্য সমাজের নিয়ম। ওকে একটানা বিধবার জীবন-যাপন করতে হয়েছে।

ঠাকুরমার সঙ্গে শহরে এলো শহর দেখতে। আগে কখনো দেখেনি প্রতিমা, এবারে কি মনে হলো ঠাকুরমার, নিয়ে এলো মন্দিরে পূজো দিতে। স্বামীর জন্যে পূজো, নিজের জন্যে পূজো, উপাসনার পূজো। দেখলো মন্দিরের পাশে এক সাহেবের সংগে ঠাকুরমা কথা বলছেন। অনেকক্ষণ চুপি-চুপি বলছেন। সাহেবের চোখগুলো কটা, চুলগুলো লাল আর দেখতে বাজে। সাহেব কেমন-কেমন টেরা করে চাইছিলো যেন প্রতিমার দিকে। প্রতিমা ঠাকুরের দিকে তাকাতে পারেনি, দেবীর কাছে পূজো করতে পারেনি। বারবার ফিরে ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো সাহেবকে। আর সংকুচিত হচ্ছিলো। টেনে নিচ্ছিলো শাদা শাড়ির আঁচল বারবার বুকের ওপর।

একটু পরেই ঠাকুরমা ওপরে এলেন। প্রতিমাকে ডেকে নিয়ে নামলেন সিঁড়ি বেয়ে। সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। চোখ টিপলেন। তারপর বললেন ঠাকুরমা, প্রতিমা, যা, সাহেবকে বেরুবার পথটা একটু দেখিয়ে আয়।

আহা, সাহেব যেন জানে না পথ! প্রতিমা খোঁটা দিয়ে উঠেছে। নানী, তোর ইচ্ছে হচ্ছে তুই সাহেবকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আয়।

নানী আবার বলেছে, না প্রতিমা, সাহেবের পথ ভুল হয়ে যেতে পারে। তুই দিয়ে আয়। ভুল হয়ে যাবে।

সেই ভুলই হলো! সাহেব কাছে এলো। তার হাত ধরলো। জাহাজে তুললো।

প্রতিমা চোখ বুজলে এখনো দেখতে পায় ঠাকুরমার ঠোঁটে সেই আশ্চর্য হাসি, আর চোখে সেই জ্বলজ্বল চতুরতা।

চাতুরী ছিলো কি রীতা মজিদের বিয়েতে? গায়ানার বংশগত বঞ্চনা ও চাতুরী ওদের রক্তে বেয়ে কি নেমে এসেছে রীতা মজিদের জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে? শতাব্দীর বঞ্চনা কি আজো অভিশাপ হয়ে রয়েছে প্রতিটি গায়ানীজ ভারতীয়ের জীবনে? রীতা মজিদ অনেক জেরা করেও কূল পায়নি। এখন ভাবনা ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। হাত দু'টিকে সম্বল করে চাকরির দোর খুঁজেছে। হোটেল প্যাগাসাসে হেয়ার ড্রেসার হয়েছে।

মোহন সিং সুদীপ্ত, বলিষ্ঠ। জর্জটাউনের সব মেয়ের আকাঙ্ক্ষার সিম্বল। চোখে পড়ে। দেখলে মন ডাকে। রক্ত উতল হয়। তবু কেন রীতার মন চঞ্চল হয়েছে বিয়ের আগে? পিছু টেনেছে সিরাজ সিকদারের ভেসপার আওয়াজ। কৃষ্ণচূড়ার সেই রাশ রাশ রঙ। কলেজের পাশ দিয়ে নিভৃতে হেঁটে যাওয়া। আর নিউহেভেন পার্কের সামনে বসে দু'জনের পড়ার আকুতি। নীল, ঘন নীল শাখারানদা ফুলের তপ্ততা।

মা, আমি কি সত্যিই ভালোবাসি মোহনকে? নিভৃতে মাকে জিজ্ঞেস করেছে রীতা মজিদ।

আশ্চর্য চোখে মা তাকিয়েছেন। সে প্রশ্নের উত্তর তোমার মনের মাঝেই পাবে রীতা।

বারবার জিজ্ঞেস করেছি। জবাব পাইনি মা। রীতা বলে।

যদি উত্তর না পাও তবে এ বিয়েতে এগিও না। এ বিয়েতে না যাওয়াই ভালো। মা উপদেশ দিয়েছেন।

কিন্তু পিছুটানের কি সময় আছে? পাঁচশ' কার্ড ছাপা হয়ে গেছে। চলে গেছে ঘরে ঘরে। গুঞ্জন উঠেছে ষ্টাররকে, ব্রিকডামে, বেলহ্যামে, নিউহেভেন। আর অসংখ্য বাংলোর বারান্দায়। ঈর্ষায় কম্পিত হয়েছে নোহানা, মোহনা, ব্রীনা,

কোহানা। ডাক পড়ছে ঘরে ঘরে কন্যা বিদায়ের অনুষ্ঠানে। আকর্ষণীয়া রীতা মজিদ হঠাৎ পরিবর্তিত হয়েছে অসামান্যায়।

অসামান্য মোহন সিং। ছেলেবেলায় দেখা, খেলায় বড় হয়ে ওঠা মোহন সিং কখন যে সুপুরুষ পাইলট হলো সেও এক আশ্চর্য মুগ্ধতা।

মোহন সিংয়ের প্রথম আহ্বান মনে রাখার মতো রীতা মজিদের।

চলো যাই পাসীমা ফলস-এ।

সে কোথায়? আশ্চর্য চোখ মেলে নরম ঠোঁটে আলতো সুরে জিজ্ঞেস করেছিলো রীতা মজিদ।

মাজারুনী নদীর রূপসী মোহনায়। ভেনিজুয়েলার সীমান্তের কাছাকাছি।

অতোদূর! কিভাবে যাবো? ক'দিন লাগবে? কপট বিস্ময়ে রীতার চোখমুখ ঝলসে উঠেছিলো।

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে মোহন সিং।

খুব ভোরে বেরিয়ে যাবো। সন্ধ্যায় ফিরে আসবো। রাতটা তোমার কাটাতে হবে না আমার সঙ্গে।

সে সব ইচ্ছে থাকলে আমি সঙ্গে নেই কিন্তু। ফ্লার্টের মতো রীতা কপট হেসে উঠেছিলো।

সে কথা পরে হবে। তৈরী থেকো ভোর পাঁচটায়।

কথা রেখেছে মোহন সিং। সূর্য সবে উঠি উঠি করছে। বাবার পুরনো ভক্সওয়াগনটা নিয়ে এলো ষ্টাররকে। ওয়াটার ষ্ট্রীটের ১১৭ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মোহন সিং। আর পাতা উল্টিয়েছে নতুন জীবনের।

প্লেনে চড়া রীতা মজিদের সেই প্রথম। তার ওপর ককপিটে পাইলটের সঙ্গে। তার রোমাঞ্চই আলাদা।

দশ-বারোজন অপেক্ষা করেছিলো প্লেনের জন্যে। ছেলেমেয়ে, প্রায় মধ্যবয়সী। বেশীর ভাগ ভারতীয়। নিচে মাজারুনী নদীর মোহনায় চাষাবাদ করছে। আর অপেক্ষা করছিলো রাশি রাশি বস্তা। ভর্তি তাতে আলু আর চিনি। সীমান্তের মানুষের বাঁচার সম্পদ রসদ।

সীমান্ত নিয়ে মোহন সিংয়ের চিন্তার অন্ত নেই। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চটপট উঠে পড়লো প্যাসেঞ্জাররা। রীতা মজিদ লক্ষ্য করলো প্লেনের অর্ধেক জায়গা খালি। সীটগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আর সে জায়গায় ধপাস করে কুলিগুলো ফেলছে সে বস্তাগুলো। বোঝাই শেষ হতেই প্লেনের ইঞ্জিন ষ্টার্ট দিলো মোহন সিং। ডান দিক ফিরে আমোজ রাঙ্গেলাকে হুকুম করলো–পেছনের দরজাটা বন্ধ করে এসো।

বেশ কসরৎ করতে হলো। নেভিগেটর হলে কি হবে। এখানে তাকে সব কাজ করতে হয়। প্লেনের হোস্টেস, নেভিগেটর, ষ্টুয়ার্ড সবকিছু।

দরজা বন্ধ হলেও ঠিক ল্যাচটা লাগছে না। কয়েকবার চেষ্টা করেও পারলো না আমোজ রাঙ্গেলা।

দরজা বন্ধ হচ্ছে না পাইলট, কি করবো?

জোরে টেনে ধাক্কা দাও। ড্যাম। বাষ্টার্ড। এ শালা কখনো ঠিক ব্যবহার করবে না।

চমকে ওঠে রীতা মজিদ, কাকে গাল দিলে?

হেসে বলে মোহন, ও শালার ব্যাটাকে, না, তোমাকে না, প্লেনটাকে। একটা দিন যদি ঠিক ব্যবহার করে।

গালটা যেন চট করে ডিসি থ্রি'র কানে এলো। রাগ চড়ে গেলো। ইঞ্জিনটা ধপধপ করে জ্বলে ওঠে, আবার বন্ধ হয়ে গেলো। দরজার ল্যাচটা এক ধাক্কায় সটান খুলে এলো।

আবার সজোরে গালি দিয়ে উঠলো মোহন সিং। ড্যাম, বাষ্টার্ড।

দুটো প্যাসেঞ্জার উঠে গিয়ে ধস্তাধস্তি করলো দরজাটাকে নিয়ে। দরজাটায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে আওয়াজ হলো। তারপর হঠাৎ ঝক করে বন্ধ হলো।

টেক অফের জন্যে তৈরী হয়ে নাও পাইলট। আকাশ পরিষ্কার রয়েছে, আমোজ রাঙ্গেলা বলে। আর আবহাওয়াটাও মন্দ নয়, মেঘ নেই। সোজা পথ।

আকাশের নিকুচি করেছি। মাগী আজ নীল শাড়ি পরেছে। আবার গালি ছেড়ে দিলো মোহন সিং। দিয়েই শংকিত হলো। বললো, কিছু মনে করো না রীতা, গালি না দিয়ে এ শালার প্লেন কখনো উড়তে চায় না। ভয়ানক গোঁয়ার। ট্যারা ঘাড়। ওকে গালি দিতেই হবে।

এবার চাবিটাকে ঘুরিয়ে চট করে ষ্টার্ট দিলো মোহন সিং। গর্জে উঠলো ইঞ্জিন, ভীষণ রাগ দেখালো। রীতার মনে হলো ইঞ্জিনের একটা প্রাণ আছে। সে ঈর্ষায় কাঁপছে। সে প্রাণ সহ্য করতে পারছে না একটা নতুন প্যাসেঞ্জার মোহন সিংয়ের পাশে। সজোরে ঘুরতে থাকলো প্রপেলার দুটো। আর হাওয়ায় কম্পিত হলো রীতা মজিদের শ্যাম্পু করা চুলগুলো।

তারপর হঠাৎ এক ঝটকা টানে শুয়োরের মতো ছুটতে লাগল ডিসি থ্রি। আর একটু পরেই চট করে আকাশে উড়ে পড়লো।

রীতা মজিদের মনে হলো গোঁয়ার প্লেনটা যেন একটা সুন্দর পাখি হয়ে গেছে। কাঁপছে, হাসছে। দেখে রীতা মজিদের ভয় ভয় লাগলো। মনটা ছম-ছম হলো রোমাঞ্চে। ধীরে ধীরে গাছপালা, মানুষ-জন, গাড়ি অনেক দূরে সরে

গেলো। ছোট হয়ে যেতে যেতে প্রায় বিন্দুর মতো মিলিয়ে এলো। কিছুক্ষণ পরে শুধু সবুজ আর সবুজ। নির্জন গাছের পর গাছ, পাহাড় আর ভ্যালী।

খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো রীতা মজিদ। পাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘগুলো ধাওয়া করছে ডিসি থ্রি। নিচে সবুজের মখমল যেন উপাসনার গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। পাশে তীব্র গালি দিয়ে থাকা মোহন সিং বলিষ্ঠ পুরুষে পরিণত হয়েছে। আর ইঞ্জিনের গোঙানী যেন ঈর্ষায় মুখর হয়ে এসেছে।

ভালো লাগছে রীতা? মোহন সিংয়ের গালি দেয়া মুখ হঠাৎ মোলায়েম হয়ে ওঠে। আমরা এবার তেরো হাজার ফিট ওপরে উঠে গেছি। এখন শালা নিজের গতিতেই চলবে।

নিচে ককপিটের ষ্টিয়ারিং থেকে হাতটা সরিয়ে এনে নিচু করে একটু আলতো করে স্পর্শ করে মোহন সিং রীতা মজিদের কালো চুল। রীতা শক্ত মুঠি দিয়ে ধরলো ওর তীব্র লম্বা আঙুলগুলোকে। আর একটু পরে মোহন সিং ওর নাকে রীতার তীব্র পারফিউমের সৌরভ অনুভব করলো।

হঠাৎ গড়গড় করে ওঠে ইঞ্জিনটা। বাঁ পাশের প্রপেলার স্লো হয়ে আসে। আর ডান পাশে টাল খেয়ে পড়ে যেতে থাকে ডিসি থ্রি। রীতা মজিদ চলকে পড়ে মোহন সিংয়ের ঘাড়ের ওপর।

এক ঝটকায় রীতাকে সরিয়ে দেয় মোহন সিং। চিৎকার করে ওঠে। এয়ার টারবুলেন্স। শালা এতোগুলো এয়ারগ্যাপ আছে বলেনি তো কোনো শুয়োরের বাচ্চা।

ধমকে ওঠে আমোজ রাঙ্গেলাকে মোহন সিং। হা করে দেখছিস কি? সবাইকে বামদিকে সরে বসতে বল। ব্যালেন্স করতে হবে।

ব্যালেন্স করার আর সময় হয় না। তার আগেই যেন ঝটপটিয়ে সব ডান দিকে সরে পড়েছে। ককপিট থেকে রীতা লক্ষ্য করে প্লেনটা গোঁ গোঁ করে সোজা নিচের দিকে তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে।

আঁৎকে চিৎকার করে ওঠে রীতা মজিদ।

মোহন, মোহন, দেখো দেখো।

হা হা করে হেসে ওঠে মোহন। এ শালা নিচে কখনো যাবে না, ভয় নেই রীতা, ব্যালেন্স হলেই হলো।

ততোক্ষণে সবাই বাঁ দিকে সরে ফিরে বসেছে। তবে প্লেনটা একটু যেন ডানদিকে ঠেসে রয়েছে। গোঙানির গোঁটাও কমে এসেছে। বস্তা আরো কিছু সরানো দরকার, হাত লাগাও। মোহন চিৎকার করে বলে। আবার নিঃশব্দে আমোজ রাঙ্গেলা পেছনে চলে যায়।

দু'চারজন প্যাসেঞ্জারকে ডাকে। হাতে হাত দেয়। শক্ত ভারী বয়সী দুটো ছেলেকে আনে। ঠাসা-ঠাসা বস্তাগুলোকে আঁকড়ে টেনে-হিঁচড়ে বামদিকে নেয়ার চেষ্টা করে। আর ততোক্ষণে প্লেনের মর্জিটাও ভালো হয়ে আসে। গোঙানীটা বন্ধ করে মৃদু আওয়াজে এগিয়ে যায়।

মোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগছে রীতা?

রীতা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, সাহসী পুরুষ বটে মোহন সিং। শুধু চোখের তারাগুলো সরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে হাসে।

নিচে তাকিয়ে দেখো রীতা, মাজারুনী নদীর মোহনা। নামতে হবে ওখানে।

কোথায় নামবো? শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, গাছ আর গাছ, এয়ারপোর্ট কোথায়? রীতা শংকিত হয়ে ওঠে।

আবার হা হা করে হাসে মোহন সিং। হাসিটা যেন ওর বদঅভ্যাস, অল্প কথাতেই হা হা করে হাসে। বিরাট হাসি, উদার হাসি। এবারে মোহন সিংয়ের হাসিতে মুগ্ধ হয় রীতা। মনে হয় মোহন যেন রীতার উদাত্ত পুরুষ।

হাজারখানেক ইণ্ডিয়ানের জন্যে শালা বার্ণহ্যাম এয়ারপোর্ট বানাবে। মাথা খারাপ। নিগার হলে না হয় কথা ছিলো। ইণ্ডিয়ান জন্মেছে কাঙাল হয়ে। এখন নিগারের রাজত্বে ও বাঁচবে কাঙাল হয়ে। তবে কি হবে? রীতা বলে।

নিচের দিকে চরের কিছুটা মাটি খালি আছে। কাটা আছে। সেখানেই নামবো। নদীর পাড়েই নেমে যাবো। মোহন বলে।

কথা শেষ হতে না হতেই বাজপাখির মতো নিচে ডুব দিলো ডিসি থ্রি। কিছুক্ষণ পরেই নদীর পাড়ে কংকর ঢাকা রাস্তার ওপর সড়সড় করে নেমে পড়লো।

প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ হতে না হতেই ছুটে এলো একঝাঁক ছেলেমেয়ে বুড়ো। স্বল্পবসনা হলেও ওরা ভারতীয় বংশের যে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে ওরা ধান বোনে, ধান ঝাড়ে।

গোটা চারেক লোক ছাড়া প্রায় সবাই নেমে পড়লো প্লেন থেকে। ধপাধপ বস্তাগুলোও নামিয়ে আনা হলো। মিনিট পনেরোর মধ্যেই প্লেনটা খালি হয়ে গেলো।

ঘড়ির দিকে তাকালো রীতা মজিদ। সবে সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। ভাবলো মোহন সিংয়ের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো রীতা মজিদ। এবার হয়তো কোমল হয়ে আসবে মোহন সিংয়ের গলা। প্রথম বেড়াতে বেরিয়ে এতো খিস্তি আর গালাগালি রীতা মজিদের ভালো লাগেনি। মোহন সিং বললো এবার আমাদের আসল যাত্রা শুরু। ভেনেজুয়েলার বর্ডারে,

সেখানে তোমায় লাঞ্চ খাওয়াবো।

সে কি? কাজ শেষ হয়নি তোমার?

না। সবে তো শুরু, এখান থেকে যাবো পাসীমা ফলস্-এ। সেখানে ঘন্টা দেড়েক থাকতে হবে। তোমায় লাঞ্চ খাওয়াবো। তারপর সোজা ফেরত আসবো জর্জটাউন।

কি করবে ওখানে তুমি? কিছুটা বিরক্ত হয় রীতা।

সে তুমি গেলেই বুঝতে পারবে। তাছাড়া, ওদের নামাতে হবে না?

রীতা তাকিয়ে দেখে প্লেনের ভেতর এখনো গুটিসুটি মেরে বসে আছে চার পাঁচজন আমেরিনদিয়ান।

ও ক'টি আমেরিনদিয়ানের জন্যে তুমি অতোদূর যাবে? না গেলে হয় না? রীতা চাইছে জর্জটাউন ফিরে যেতে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে যেতে পার্কে। কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় বসে মোহন সিংয়ের সংগে গল্প করতে। ছেলেবেলার গল্প। একলা দোকলা খেলার গল্প।

আরে না, মোহন সিং বাদ সাধে, ওরা তো ফাউ, আসলে যাওয়া যে রত্নের জন্য সে তুমি গেলে দেখতে পাবে।

রত্ন? সে কি রত্ন বল না গো। রীতার সোহাগী গলা।

অপেক্ষা করো। সাসপেন্স রাখে মোহন সিং। তারপর লাফ দিয়ে ককপিটে উঠে বসে এবং ঝট করে আকাশে উড়ে যায়।

ভয়ানক আনসোশ্যাল মনে হয় মোহন সিংকে। ককপিটে বসেছে বলে কি রাজ্যের সমস্ত ভাবনা আর চিন্তা মুখে নিয়ে থাকবে? রীতা ভাবতে থাকে।

কথাই যদি না বলবে, যদি খালি গালিই দেবে, তবে রীতাকে ডেকে আনলে কেন? না আনলেই পারতে? এ কোন ধরনের ফিঁয়াসে নিয়ে বেড়াতে বেরুনো!

কখন যে তন্দ্রা নেমে এসেছে রীতার চোখে বুঝতে পারেনি। যখন উঠলো, তখন দেখলো একটা অন্ধ বৃত্ত যেন ওর চারদিকে ঘিরে রয়েছে। সারা আকাশ অন্ধকার। কালো পেঁজাপেঁজা তুলোয় ঢাকা। আর শুধু পশ্চিমে সূর্যের একটা আলো সোজা ঠিকরে পড়ছে। কালো মেঘগুলো যেন সজোরে ধাওয়া করে চলেছে সেই সরু আলোকে।

একটা বিবর্ণ আওয়াজ বেরুলো রীতার গলা থেকে। কি হয়েছে?

হ্যারিকেনের মাঝে পড়ে গেছি। মোহন সিং বলে। বুঝতে পারলামনা আমরা পথ হারিয়েছি কি না।

আমোজ রাঙ্গেলা চেপে চেপে বলে, দিক হারালে আমরা ভেনেজুয়েলায় গিয়ে পৌঁছব। ওরা আমাদের ওয়েলকাম করে নেবে।

আমাদের নয়, তোমাকে হয়তো। আমেরিনদিয়ান তুমি, ওদের জাতভাই। আমাদের সন্দেহ করবে।

রীতা বলে—কেন? সন্দেহ কেন?

মোহন সিং জবাব দেয়, কেন দেখনি বর্ডারে সব ফোর্স এনে রেখেছে। যে কোনোদিন গায়ানায় মার্চ করতে পারে। আমরা পথ ভুল করে এসেছি, সেটা বিশ্বাস নাও করতে পারে। ভাববে, স্পাইং করছি।

বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করে রীতা। ধরুক না ওকে স্পাই হিসেবে। মাতাহারি হবে, দেশের জন্য প্রাণ দেবে।

আমোজ রাঙ্গেলা বলে, জেলে নাও ফেলতে পারে। বিপদের মাঝে আমোজ আশান্বিত। ওরা টাকা-পয়সা দিয়ে সব গায়ানিজদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটল করাচ্ছে, আমাদেরও করাবে।

মোহন সিং কথা বলে না। গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে থাকে। আর একটু পরেই কালো মেঘের পর মেঘ প্লেনটাকে আবৃত করে দেয়। ভেতরে ডিসি থ্রি থপথপ করে কাঁপতে থাকে। রীতার মনে হয় যেন একটা বিরাট দানবের বুকের মাঝে বসে ভীতু কবুতরের মতো থরথর করে কাঁপছে প্লেনটা।

রীতা ভাবতে থাকে। আশ্চর্য, সে আঁধার আর হ্যারিকেনের মাঝেই হঠাৎ নিচে নামতে থাকে ডিসি থ্রি। একটু পরেই আঁধার কেটে ভেসে এলো নদীর পাড়। নামিয়ে দিলো ডিসি থ্রিকে।

রীতা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালো মোহন সিংয়ের দিকে। গর্বের দৃষ্টিতে। এবারে কিন্তু কেউ ছুটে এলো না প্লেনটির পাশে। মনে হলো কেউ যেন লক্ষ্য করলো না কতোটা বিপদ কাটিয়ে ওরা ফিরে এসেছে মোহন সিংয়ের কৃতিত্বে। ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো রীতা।

সারি সারি টিনের ছাপড়া রয়েছে, কয়েকজন লোক নিজেদের কাজ নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত।

নেমে এসো রীতা। নিচে থেকে ডাকলো মোহন সিং। হাত বাড়িয়ে দিলো। নামতে গিয়ে হঠাৎ চলকে পড়লো রীতা। ঝাঁপিয়ে পড়লো মোহন সিং। ধরলো বিবর্ণ আলিঙ্গনে।

এখানেই আমরা লাঞ্চ খাবো, এসো।

রীতা লাল কাঁকরের পথটুকু সাবধানে হেঁটে এলো। হাইহিলে কষ্ট হচ্ছিলো। এলো সেই টিনের ছাপড়াগুলোর কাছে। গোটা পঞ্চশেক লোক আট দশটি ছাপড়ায় ভীষণ ব্যস্ত। হাতে, পায়ে, মুখে তাদের রক্ত আর রক্ত।

অবাক হয়ে দেখে রীতা মজিদ, ওমা, এ যে সারি বাঁধা কসাইখানা! ঝুলে

রয়েছে একটার পর একটা জবাই করা গোরু।

লম্বা ছুরি দিয়ে তেছরা করে কেটে চামড়াগুলো বের করেছে গোটা কয়েক আমেরিনদিয়ান। তারপরই একেক জনে বড় কুড়াল নিয়ে দু'ভাগ করে ফেলছে কারকাসকে। হা করে তাকিয়ে আছে মরা গোরুগুলোর চোখ। বীভৎস চোখ, জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

এসেছো মোহন? সজোরে হাসলো এক আমেরিনদিয়ান। দেরি হয়ে গেলো যেন।

আর বলো না, কালো ঝড়ের মাঝে পড়েছিলুম। ভাবলাম বুঝি আজকে ফেঁসেই যাবো ওদের গহ্বরে।

হলে হতো। হাসে বুড়োটি। তোমাকে নিয়ে নিলে খুশী হতো ওরা।

সবাই তোমরা আমেরিনদিয়ান চাচাতো ভাই। আমাদের মতো নওতো, বারো হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে। আমাদের বিদেশীতো ভাববেই। মোহন খেঁকিয়ে উঠলো।

বুড়ো গায়ে কথা মাখলো না। হেসে জিজ্ঞেস করে, সঙ্গে কে শুনি? দেখিনি তো আগে কোনোদিন।

পরিচয় করিয়ে দিলো মোহন সিং। রীতা মজিদ, জর্জটাউনে কলেজে পড়ে।

মাথা নিচু করে নড্ করে বুড়োটি। হলদে দাঁতগুলো বের করে ঝকঝকে হাসে।

মাদাম, হাত বাড়ালেই রক্ত লেগে যাবে। এ্যাপোলজি চায় বুড়োটি। মাদাম ইউ আর ওয়েলকাম।

রীতা তাকিয়ে দেখে। আর সবাইকে ট্রেইনী মনে হয়। সবাই ওকে দেখে মুচকি-মুচকি হাসছে।

খাবার দাও ওস্তাদ, ক্ষিদে পেয়েছে, দু'জনের জন্যে দেবে কিন্তু। মোহন হুকুম দেয়।

জানি জানি। বুড়োটি বলে। তোমাদের জায়গায় তোমরা গিয়ে বসো। খেয়াল আছে আমার। তোমরা দু'জনেই।

এসো রীতা, মোহন সিং ডাকে।

ওরা পায়ে হেঁটে হেঁটে ছাপড়াগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট টিলার কাছে যায়। সে টিলা থেকে নিচে তাকিয়ে বিস্মিত হয় রীতা।

নিচে বহু নিচে সাপিনীর মতো বয়ে যাচ্ছে মাজুরুনী নদী। আর নদীর পাড়ে থাক থাক করে সাজানো রয়েছে নারকেল আর পাম গাছের সারি। আর দূরে বহু দূরে আকাশের সংগে মাথা ঠেকিয়ে সেজেগুজে বসে রয়েছে তিন তিনটি

পাহাড়। লাল হলুদ সবুজ টিপ দেয়া।

রীতা একটু কাছ ঘেঁষে বসে মোহন সিংয়ের। মোহন সিং ওর হাতটা টেনে নেয়। কনে আঙ্গুলকে বাছাই করে নিঃশব্দে একটি আংটি পরিয়ে দেয়। শুধু বলে:

এটা গ্রহণ করো রীতা।

রীতা কবুতরের মতো কাঁপতে থাকে। মুখে রা বেরোয় না। নিঃশব্দে ওর মনের সব অনুভূতি প্রকাশ করে।

রীতার নিঃশব্দতায় রোমাঞ্চিত হলো মোহন সিং। আর রীতা নতুন যুবককে মুখর করার নিঃস্ব প্রতিশ্রুতি দিলো। বিয়ে হয়ে গেলো অনাড়ম্বরে।

ওর চঞ্চল মনকে অস্বীকার করেই।

আমি তো জীবনে কাউকে বঞ্চনা করিনি খোদা, কাউকে ঠকাইনি। কাউকে চাতুরি করিনি, কারো কাছ থেকে এক ডলার বেশী নেইনি, এক ডলার কম দেইনি। তবু আমার জীবনে এতো বঞ্চনা কেন? রহমান মজিদের এ প্রশ্ন অহরহ মনে পড়ে। প্রশ্ন করে সন্ধ্যায়, সকালে, জর্জটাউনের সাগরপাড়ে, সীওয়ালের কাছে। প্রশ্ন করে পরিচিত যারা আছে তাদের কাছে। সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে প্রশ্ন করে নিজের মনকে।

আমার পূর্বপুরুষের বঞ্চনা কি আমাদের মাঝেও এসেছে?

না আমরা নিজেরাই আমাদের জীবনকে বঞ্চনায় তিক্ত করেছি?

তিক্ত রহমান মজিদ নিজের জীবন নিয়ে নয়। আশ্চর্য প্রীতিময়ী পারমিতা তার স্ত্রী। তার পাশে থেকে তার সব ঐশ্বর্য সব ব্যবসা আহরিত হয়েছে স্ত্রী পারমিতার বিষয় বিবেচনায়। সারাটা জীবন সৎ ও পরিশ্রমী রয়েছে। কিন্তু তিক্ত হয়েছে রহমান মজিদের জীবন, তাদের নিয়ে যারা তার সবচেয়ে আদরের। তার ছেলে আর তার মেয়ে।

কেন তার ছেলে শোভন মজিদের জীবন বিষাক্ত হয়ে গেলো? কেন তার মেয়ে রীতা মজিদের জীবন হয়ে এলো কলংকিত? নিজে রহমান মজিদ স্কুল পাশ করেনি। গরীব বাবার সংসারে সাহায্য করেছে। সে ব্যথা ঢাকতে অনেক ভালো করে পড়িয়েছে নিজের ছেলেকে। কলেজে, বড় স্কুলে, প্রাইভেট মাস্টার ডেকে, অনেক টাকা খরচ করে। সে পড়ার কি ফল হলো? এক পর্তুগীজ মাদেরিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়ে এখন হিপ্‌পি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। না করেছে বিয়ে। না হচ্ছে এনগেজমেন্ট শুধু লিভিং টুগেদার। এর মধ্যে একটি বাচ্চাও হয়েছে। অথচ ওদের বয়স তো একুশও পেরোয়নি। বাচ্চাটি কি ওর নাতি? কি করে নাতি হবে? বিয়েও তো হয়নি।

সহনিবাসে রহমান মজিদের বিশেষ কোনো বিশ্বাস নেই। ছেলেকে ডেকে এনে ধমকে বলেছিলো, ইসলামে এটা বড় গুনাহ। এটা কখনো করো না। তার চেয়ে বিয়ে করে ফেলো।

না। শোভন বেঁকে বসেছে। আজকাল ওটা ষ্টাইল নয়। বন্ধনে কেউ আবৃত হতে চায় না।

বিয়েটা বন্ধন নয়। মা পারমিতা এক্সপ্লেইন করেছে পরে। বিয়ে হচ্ছে সমাজের স্বীকৃতি, ধর্মের স্বীকৃতি। তার বাইরে চলে গেলেই ধিক্কার উঠবে গায়ানীজ সমাজে।

উঠুক ধিক্কার। ছেলে ঘাড় বেঁকিয়ে বলে। আসবে সেটা তোমাদের মতো বুড়োদের কাছ থেকে। আমরা লিভিং টুগেদার খারাপ চোখে দেখি না।

পারমিতা আরো বোঝায়। না দেখিস, কিন্তু লিভিংয়ের আকর্ষণ কি বল? প্রয়োজন কি? বিয়েটা করলেই হয়।

বুঝতে পারছো না মা তুমি। ছেলে শোভন বিরক্ত হয়। বিয়ে হচ্ছে একটা বন্ধন। এটাতে মনের টান থাকুক আর না থাকুক, জোর করে মনের টান রাখতে হবে। একসঙ্গে জোর করে মিশে থাকতে হবে। আমরা সেটা চাই না।

পারমিতা বলে, কি জানি, তোমাদের এ মনস্তত্ত্ব আমি বুঝি না। আমরা যে বাইশ বছর ধরে ঘর করে এসেছি তোর বাবা আর মা, কই, কোনো বন্ধন তো দেখতে পাচ্ছি না?